প্রথম আলো

তারিখ ২৭ FEB 2014
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

কালের পুরাণ | সোহরাব হাসান

ছাত্ররাজনীতি এখন লাভজনক ব্যবসা?

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ছাত্রদলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বিগত আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার জন্য তাঁদের দায়ী করেছেন। ছাত্রদলের বর্তমান নেতাদের ব্যর্থ আখ্যায়িত করে নেতৃত্বে পরিবর্তন আনার কথা বলেছেন। অছাত্রদের বাদ দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন। এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপি-জামায়াত-সমর্থক শিক্ষকেরা নাকি তাঁকে সে রকম পরামর্শই দিয়েছেন। তবে ওই শিক্ষকেরা শিক্ষাঙ্গনে কোনো সমস্যা নিয়ে বিএনপি নেত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন বলে জানা যায়নি।

আপাতদৃষ্টিতে খালেদা জিয়ার এ বক্তব্যে ছাত্রদের দিয়ে ছাত্ররাজনীতি করার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে বলে অনেকে আহ্লাদিত হতে পারেন। কিন্তু খটকা লেগেছে ছাত্ররাজনীতির উদ্দেশ্য ও আদর্শ-সম্পর্কিত তাঁর ধ্যানধারণা নিয়ে। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে ছাত্রদলের সঠিক নেতৃত্বের অভাবেই বিগত সরকারবিরোধী আন্দোলনটি সফল হতে পারেনি। অর্থাৎ বিএনপি নয়, ছাত্রদলকেই সরকারবিরোধী আন্দোলন সফল করতে হবে। শেখ হাসিনার সরকারের বিরুদ্ধে 'গণতন্ত্রের অভিযাত্রা' নামে তিনি যে সর্বাত্মক অসহযোগের ডাক দিয়েছিলেন, সেটি কেন ছাত্রদল সফল করতে পারল না, সেই জবাবদিহিও চেয়েছেন তিনি।

এখানে আমরা স্মরণ করতে পারি যে বিএনপির নেত্রী ছাত্রদলের নেতাদের শিক্ষাঙ্গনের হানাহানি ও নৈরাজ্য বন্ধের কথা বলেননি, বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারদলীয় ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের সন্ত্রাস মোকাবিলা করার কথা বলেননি। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যে সেশনজট চলছে, ঠিকমতো ক্লাস-পরীক্ষা হচ্ছে না, সে ব্যাপারে কিছু করার কথা বলেননি। তিনি তাঁদের প্রতি একটি প্রশ্নই রেখেছেন, ছাত্রদল কেন সরকারকে ফেলে দিতে পারল না। ছাত্রদলই যদি সরকারকে ফেলে দেবে, তাহলে বিএনপির প্রয়োজনটা কী?

এই হলো ছাত্রসংগঠন তথা ছাত্রসমাজের প্রতি আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের আবদার। এই আবদার যে কেবল বিরোধী দল বিএনপি করেছে তা-ই নয়, ক্ষমতাসীন দলটি অন্য রকম আবদার নিয়ে হাজির হয়। সম্প্রতি একজন মন্ত্রী বলেছেন, বিরোধী দলের আন্দোলন মোকাবিলার জন্য ছাত্রলীগই যথেষ্ট। এর অর্থ দাঁড়ায় ছাত্রলীগ নামের সংগঠনের নেতা-কর্মীরা পড়াশোনা বাদ দিয়ে ছাত্রদের সমস্যা এড়িয়ে গিয়ে একটাই কাজ করবেন, তা হলো বিরোধী দলকে ঠ্যাঙানো। একদিকে তাঁরা সরকার উৎখাতের, অন্যদিকে বিরোধী দল ঠ্যাঙানোর হাতিয়ার হবেন।

এই হলেন আমাদের অতি বিজ্ঞ রাজনীতিকদের চিন্তাভাবনা। দেশ গোল্লায় যাক, ছাত্রদের পড়াশোনা লাটে উঠুক। কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছাত্রসংগঠনকে তাঁদের ক্ষমতায় যাওয়ার ও থাকার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করবেনই। শিক্ষাঙ্গনের সমস্যা সমাধান হোক বা না হোক, শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন সচল থাকুক বা না থাকুক, সেসব নিয়ে তাঁদের মাথাব্যথা নেই। এক পক্ষ সরকারের বিরুদ্ধে ছাত্রদলকে নামাতে মরিয়া, আরেক পক্ষ বিরোধী দলের বিরুদ্ধে ছাত্রলীগকে দাঁড় করাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

অছাত্র বা আদুভাইদের নিয়ে ছাত্রসংগঠন করার উদ্দেশ্য ছাত্ররাজনীতিকে সুস্থ ও সঠিক পথে নিয়ে আসা নয়, বরং ছাত্ররাজনীতির নাম ভাঙিয়ে রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করা। এ কাজটি কেবল বিরোধী রাজনৈতিক দলই করে থাকে তা-ই নয়, সরকারি দলও একই কাজ করে। যেহেতু তাদের হাতে সরকার, পুলিশ, প্রশাসন আছে, সেহেতু ছাত্রসংগঠনের ওপর ততটা নির্ভর করতে হয় না। কিন্তু বিরোধী দলের প্রধান হাতিয়ারই হয়ে ওঠে ছাত্রসংগঠন।

অছাত্রদের নিয়ে ছাত্রসংগঠন করার রেওয়াজ শুরু হয় স্বাধীনতার পর থেকেই। ছাত্রনেতাদের যখন বিশ্ববিদ্যালয় পড়াশোনা শেষ হয়ে যায়, তখন নেতৃত্ব ধরে রাখার জন্য অন্য একটি বিষয়ে (এ ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানই ভালো দৃষ্টান্ত) ভর্তি হয়ে থাকেন। তাঁরা ভর্তি হন বটে, পাস করে বের হন না। বের হলেই ছাত্রনেতৃত্ব চলে যাবে।

পাকিস্তান আমলে নিয়মিত ছাত্ররাই ছাত্রসংগঠনের নেতৃত্ব দিতেন। শিক্ষাঙ্গনের সমস্যা নিয়ে আন্দোলন করতেন। এ দেশে ষাটের ও আশির দশকে যে দুটি ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠে, দুটিই ছিল শিক্ষাকেন্দ্রিক, সরকারের গণবিরোধী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ছাত্ররা রাজপথে নেমে এসেছিলেন এবং জীবন দিয়েছিলেন। আশির দশকের পর ছাত্রদের সমস্যা নিয়ে ছাত্রদের বড় ধরনের কোনো আন্দোলন চোখে পড়ে না।

রাজনৈতিক দলগুলো ছাত্রসংগঠনগুলোকে নিজেদের অনুগত ও বাধ্যগত সংগঠন হিসেবে পরিচালিত করতে চায়। এ কারণে তাঁদের কেউ সংগঠনের সাংবিধানিক অভিভাবক হন, কেউ বা সংগঠনের নেতৃত্বে কে আসবেন, তা ঠিক করে দেন। সম্মেলন করে কাউন্সিলরদের ভোটে ছাত্রনেতৃত্ব গঠনের রেওয়াজ অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। মাঝখানে ছাত্রলীগ নির্বাচনের মাধ্যমে নেতৃত্ব দেওয়ার একটি মহড়া দিলেও পরবর্তীকালে ছাত্রদলকেই অনুসরণ করতে থাকে। সম্মেলন হবে, কাউন্সিলররা আসবেন, কিন্তু নেতৃত্ব বাছাই করবেন আপা বা ম্যাডাম। ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ উভয় সংগঠন এখন পরিচালিত হচ্ছে প্রধানত অছাত্রদের দিয়ে। কমিটির মেয়াদ তিন থেকে চার বছর পার হলেও নতুন নেতৃত্ব গঠনের উদ্যোগ নেই। ছাত্রত্ব নেই, তবু তাঁরা ছাত্রনেতা।

সবচেয়ে অবাক কাণ্ড, বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার যাদের স্বৈরাচারী সামরিক শাসক হিসেবে চিহ্নিত করতে ভালোবাসে, সেই সামরিক শাসনামলে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হলেও এখন আর সেটি হচ্ছে না। জিয়াউর রহমান ও এরশাদ দুই সামরিক শাসকই ডাকসুসহ সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন দিয়েছিলেন এবং অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিরোধী দলের সমর্থক ছাত্রসংগঠন জয়ী হয়েছিল। কিন্তু গত দুই দশকের গণতান্ত্রিক সরকারগুলো ছাত্র সংসদ নির্বাচনের নামও মুখে আনেনি।

অতীতে ছাত্রসংগঠনগুলোর নেতৃত্ব গড়ে উঠত ছাত্র সংসদ নির্বাচনে জয়ী নেতাদের নিয়েই। যাঁরাই ডাকসু, চাকসু, রাকসু প্রভৃতি ছাত্র সংসদে নির্বাচিত হতেন, তাঁরাই পরবর্তীকালে ছাত্রসংগঠনের শীর্ষ নেতৃত্বে আসতেন। আবার কখনো ছাত্রসংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্য থেকেও ছাত্র সংসদের নেতা হতেন। এসব ছাত্রনেতা কেবল নিজের সংগঠনের নেতা-কর্মীদের কাছে আস্থাভাজন ছিলেন না, আস্থাভাজন ছিলেন দলমত-নির্বিশেষে সব ছাত্রসংগঠনের নেতা-কর্মীদের।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে গণতান্ত্রিক শাসনামলে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের প্রক্রিয়াটি বন্ধ হয়ে যায়। এ ব্যাপারে স্বাধীনতাবিরোধীদের দোসর বিএনপির সঙ্গে স্বাধীনতার চেতনাধারী আওয়ামী লীগের কোনো পার্থক্য নেই। আওয়ামী লীগ ডাকসুসহ সব ছাত্র সংসদ নির্বাচন দিয়ে এ পার্থক্য দৃশ্যমান করলে ছাত্রসমাজ উপকৃত হবে। দুই বড় দলের শীর্ষ নেত্রী তিন দশকের বেশি সময় ধরে দলের নেতৃত্বে থাকলেও ছাত্রসংগঠনের নেতৃত্ব গড়ে তোলার পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে আছেন। সম্ভবত তাঁরা চান না যোগ্য ও দক্ষ নেতৃত্ব আসুক। তাঁরা চান অনুগত ছাত্রনেতৃত্ব। এই অনুগত ও বাধ্যগতদের দিয়ে আর যা-ই হোক, ছাত্ররাজনীতি এগিয়ে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এই ছাত্ররাজনীতি সাধারণ ছাত্র বা শিক্ষার কোনো কল্যাণ করবে না। গোষ্ঠী ও ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষা করবে।

মূলত ছাত্রদের কল্যাণে, ছাত্রদের স্বার্থে এবং ছাত্রদের সমস্যা সমাধানের জন্য নিয়োজিত হওয়া উচিত ছাত্ররাজনীতি। আজ দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, ছাত্ররাজনীতি আর ছাত্রদের স্বার্থ ও কল্যাণের চিন্তা করে না। এমনকি তারা রাজনৈতিক দলের স্বার্থ রক্ষা করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

প্রথম কথা হলো ছাত্ররাজনীতির কাছে রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রত্যাশা কী? এই প্রত্যাশা যদি দলকে ক্ষমতায় আনা এবং ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত করা হয়, তাহলে সেটি ছাত্ররাজনীতি থাকে না। তাদের রাজনৈতিক দলেরই নেতৃত্বে এসেই সেই কাজটি করা উচিত।

সম্প্রতি ছাত্রদলের নেতাদের সঙ্গে এক বৈঠকে খালেদা জিয়া কয়েকজনের নাম উল্লেখ করে যে প্রশ্নটি করেছেন, সেই প্রশ্নটি সব ছাত্রসংগঠনের প্রায় সব ছাত্রনেতার উদ্দেশে করা যায়। করা উচিত। ছাত্রদল নেতাদের উদ্দেশে তিনি প্রশ্ন রেখেছেন, 'তোমাদের এত বয়স, চাকরি করো না, ব্যবসা করো না, তোমরা চলো কীভাবে? তোমাদের পরিবার থেকে এখনো তোমাদের টাকা দেয়?'

বিএনপির চেয়ারপারসনের অজানা নয় যে যাঁরা চাকরি করেন না এবং যাঁদের ছাত্রত্ব অনেক আগেই পার হয়ে গেছে, তাঁরাই ছাত্রনেতৃত্ব আঁকড়ে আছেন। তবে ছাত্রনেতাদের কাছে এ প্রশ্ন করার আগেই তাঁর নিজের কাছে প্রশ্ন করা উচিত এ অছাত্রদের কেন তিনি ছাত্রনেতৃত্বে রেখেছেন। একজন তরুণ, যাঁর ছাত্রত্ব নেই, তাঁকেই ছাত্রনেতৃত্ব দিয়ে অবৈধ আয়ের এবং অনৈতিক প্রভাব বিস্তারের সুযোগ করে দিয়েছেন।

এত দিন ক্ষমতার রাজনীতিকে লাভজনক ব্যবসা হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। মন্ত্রী, সাংসদ, উভয় পক্ষের রাজনীতিকেরা নিজেদের আচরণ ও কর্মকাণ্ডে তার প্রমাণও দিয়েছেন, দিচ্ছেন। হালে দেখা যাচ্ছে কেবল জাতীয় রাজনীতিই নয়, ছাত্ররাজনীতিও লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। ক্ষমতায় থাকতে এ ব্যবসায় সরাসরি লাভবান হওয়া যায়, আর ক্ষমতার বাইরে থাকলে ভবিষ্যতের বিনিয়োগ হিসেবে কাজ করে। বিএনপির নেত্রী এবারের বিনিয়োগের সুফল পাওয়া যায়নি বলে আক্ষেপ করেছেন। ভবিষ্যতে ছাত্রদলকে দিয়ে সেই বিনিয়োগের লাভ সুদে-আসলে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করবেন নিশ্চয়ই।

● সোহরাব হাসান : কবি, সাংবাদিক।
sohrab03@dhaka.net